

ছোট গল্প

ম্যাজিশিয়ান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, শুনেছি এক সময়ে তুমি বড়ো বড়ো কথা নিয়ে খুব বড়ো বড়ো বই লিখেছিলে।

জীবনে অনেক দুষ্কর্ম করেছি, তা কবুল করতে হবে। ভারতচন্দ্র বলেছেন, সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

আমার ভালো লাগে না মনে করতে যে, আমি তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি।

ভাগ্যবান মানুষেরই যোগ্য লোক জোটে সময় নষ্ট করে দেবার।

আমি বুঝি তোমার সেই যোগ্য লোক?

আমার কপালক্রমে পেয়েছি, খুঁজলে পাওয়া যায় না।

তোমাকে খুব ছেলেমানুষি করাই?

দেখো, অনেকদিন ধরে আমি গস্তীর পোশাকি সাজ পরে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমানুষির ঢিলে কাপড় পরে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নষ্ট করার কথা বলছ, দিদি— এক সময় তার হুকুম ছিল না। তখন ছিলুম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। শেষের কটা দিন আরামে কাটবে। ছেলেমানুষির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

তোমার এই ছেলেমানুষির নেশাতেই তুমি যা খুশি তাই বানিয়ে বলছ।

কী বানিয়েছি বলো।

যেমন তোমাদের ঐ হ. চ. হ.; অমনতরো অদ্ভুত খ্যাপাটে মানুষ তো আমি দেখি নি।

দেখো দিদি, এক-একটা জীব জন্মায় যার কাঠামোটা হঠাৎ যায় বেঁকে। সে হয় মিউজিয়মের মাল। ঐ হ. চ. হ. আমার মিউজিয়মে দিয়েছেন ধরা।

ওঁকে পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছিলে?

তা হয়েছিলুম। কেননা তখন তোমার ইরুমাসি গিয়েছেন চলে শ্বশুরবাড়ি। আমাকে অবাক করে দেবার লোকের অভাব ঘটেছিল। ঠিক সেই সময় এসেছিলেন হরীশচন্দ্র হালদার একমাথা টাক নিয়ে। তাঁর তাক লাগিয়ে দেবার রকমটা ছিল আলাদা, তোমার ইরুমাসির উল্টো। সেদিন তোমার ইরুমাসি শুরু করেছিল জটাইবুড়ির কথা। ঐ জটাইবুড়ির সঙ্গে অমাবস্যার রাত্রে আলাপ পরিচয় হত। সে বুড়িটার কাজ ছিল চাঁদে বসে চরকা কাটা। সে চরকা বেশিদিন আর চলল না। ঠিক এমন সময় পালা জমাতে এলেন প্রোফেসার হরীশ হালদার। নামের গোড়ায় পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো। তাঁর ছিল ম্যাজিক-দেখানো হাত।

একদিন বাদলা দিনের সন্কেবেলায় চায়ের সঙ্গে চিঁড়েভাজা খাওয়ার পর তিনি বলে বসলেন, এমন ম্যাজিক আছে যাতে সামনের ঐ দেয়ালগুলো হয়ে যাবে ফাঁকা।

পঙ্কানন দাদা টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এ বিদ্যে ছিল বটে
ঋষিদের জানা।

শুনে প্রোফেসার রেগে টেবিল চাপড়ে বললেন, আরে রেখে দিন আপনার
মুনি ঋষি, দৈত্য দানা, ভূত প্রেত।

পঙ্কানন দাদা বললেন, আপনি তবে কী মানেন।

হরীশ একটিমাত্র ছোটো কথায় বলে দিলেন, দ্রব্যগুণ।

আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, সে জিনিসটা কী।

প্রোফেসার বলে উঠলেন, আর যাই হোক, বানানো কথা নয়, মন্তর নয়,
তন্তর নয়, বোকা-ভুলোনো আজগুবি কথা নয়।

আমরা ধরে পড়লুম, তবে সেই দ্রব্যগুণটা কী।

প্রোফেসার বললেন, বুঝিয়ে বলি। আগুন জিনিসটা একটা আশ্চর্য
জিনিস, কিন্তু তোমাদের ঐ-সব ঋষিমুনির কথায় জ্বলে না। দরকার হয়
জ্বালানি কাঠের। আমার ম্যাজিকও তাই। সাত বছর হরতকি খেয়ে
তপস্যা করতে হয় না। জেনে নিতে হয় দ্রব্যগুণ। জানবা মাত্র তুমিও পার
আমিও পারি।

কী বলেন প্রোফেসার, আমিও পারি ঐ দেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতে?

পার বৈকি। হিড়িংফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।

আমি বললেম, বলে দিন-না কী চাই।

দিচ্ছি। কিছু না— কিছু না, কেবল একটা বিলিতি আমড়ার আঁঠি আর শিলনোড়ার শিল।

আমি বললুম, এ তো খুবই সহজ। আমড়ার আঁঠি আর শিল আনিয়ে দেব, তুমি দেয়ালটাকে উড়িয়ে দাও।

আমড়ার গাছটা হওয়া চাই ঠিক আট বছর সাত মাসের। কৃষ্ণদ্বাদশীর চাঁদ ওঠবার এক দণ্ড আগে তার অঙ্কুরটা সবে দেখা দিয়েছে। সেই তিথিটা পড়া চাই শুক্রবারে রাত্রির এক প্রহর থাকতে। আবার শুক্রবারটা অগ্রহায়ণের উণিশে তারিখে না হলে চলবে না। ভেবে দেখো বাবা, এতে ফাঁকি কিছুই নেই। দিনখন তারিখ সমস্ত পাকা করে বেঁধে দেওয়া।

আমরা ভাবলুম, কথাটা শোনাচ্ছে অত্যন্ত বেশি খাঁটি। বুড়ো মালীটাকে সন্ধান করতে লাগিয়ে দেব।

এখনো সামান্য কিছু বাকি আছে। ঐ শিলটা তিব্বতের লামারা কালিম্পঙের হাটে বেচতে নিয়ে আসে ধবলেশ্বর পাহাড় থেকে।

পঞ্চগনন দাদা এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, এটা কিছু শক্ত ঠেকছে।

প্রোফেসার বললেন, শক্ত কিছুই নয়। সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।

মনে মনে ভাবলুম, সন্ধান করাই চাই, ছাড়া হবে না— তার পরে শিল নিয়ে কী করতে হবে।

রোসো, অল্প একটু বাকি আছে। একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চাই।

পঞ্চগনন দাদা বললেন, সে শঙ্খ পাওয়া তো সহজ নয়। যে পায় সে যে রাজা হয়।

হ্যাঁ, রাজা হয় না মাথা হয়। শঙ্খ জিনিসটা শঙ্খ। যাকে বাংলায় বলে শাঁখ। সেই শঙ্খটা আমড়ার আঁঠি দিয়ে, শিলের উপর রেখে, ঘষতে হবে। ঘষতে ঘষতে আঁঠির চিহ্ন থাকবে না, শঙ্খ যাবে ক্ষয়ে। আর, শিলটা যাবে কাদা হয়ে। এইবার এই পিণ্ডিটা নিয়ে দাও বুলিয়ে দেয়ালের গায়। বাস্। এ'কেই বলে দ্রব্যগুণ। দ্রব্যগুণেই দেয়ালটা দেয়াল হয়েছে। মন্তরে হয় নি। আর দ্রব্যগুণেই সেটা হয়ে যাবে ধোঁয়া, এতে আশ্চর্য কী।

আমি বললুম, তাই তো, কথাটা খুব সত্যি শোনাচ্ছে।

পঞ্চগনন দাদা মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন বসে বসে, বাঁ হাতে হুঁকোটা ধ'রে।

আমাদের সন্ধানের ত্রুটিতে এই সামান্য কথাটার প্রমাণ হলই না। এতদিন পরে ইরুর মন্তর তন্তর রাজবাড়ি, মনে হল, সব বাজে। কিন্তু, অধ্যাপকের দ্রব্যগুণের মধ্যে কোনোখানেই তো ফাঁকি নেই। দেয়াল রইল নিরেট হয়ে। অধ্যাপকের 'পরে আমাদের ভক্তিও রইল অটল হয়ে। কিন্তু, একবার দৈবাৎ কী মনের ভুলে দ্রব্যগুণটাকে নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ফলের আঁঠি মাটিতে পুঁতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বললুম, আশ্চর্য।

হ. চ. হ. বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, দ্রব্যগুণ। ঐ আঁঠিতে মনসাসিজের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শুকোতে হবে। তার পরে পোঁতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে- প' ড়ে জোগাড় করতে লাগলুম। মাস দুয়েক লাগল আঠা মাখাতে আর শুকোতে। কী আশ্চর্য, গাছও হল ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে! এখন বুঝেছি কাকে বলে দ্রব্যগুণ। হ. চ. হ. বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয় নি।

বুঝলেম, ঐ ঠিক আঠাটা দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বুঝতে সময় লেগেছে।

*

* *

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই—
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।
নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি
জগতের ইস্কুলে তবে পাই ছুটি।
অঙ্কর কেলাসেতে অঙ্কই কষি—
সেথায় সংখ্যাগুলো যদি পড়ে খসি,
বোর্ডের 'পরে যদি হঠাৎ নাম্তা
বোকার মতন করে আম্তা-আম্তা,
দুইয়ে দুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছ্বাসে
একেবারে চ'ড়ে বসে উনপঞ্চাশে,

ভুল তবু নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই;
‘পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ’এ কোনো মজা নেই।
মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনোখানে,
কবিরা শুনেছি তারি রাস্তাটা জানে—
তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের
দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।